

মায়ী

(গল্পগ্রন্থ - রূপহলুদ)

দু'বছর আগের কথা বলি। এখনো অল্প অল্প যেন মনে পড়ে। সব ভুল হয়ে যায়। কি করে এলাম এখানে! বগুলা থেকে রাস্তা চলে গেল সিঁদরানির দিকে। চলি সেই রাস্তা ধরেই। রাঁধুণী বামুনের চাকরিটুকু ছিল অনেক দিনের, আজ তা গেল।

যাক্, তাতে কোনো দুঃখ নেই। দুঃখ এই, অবিচারে চাকরিটা গেল। ঘি চুরি আমি করিনি, কে করেছে আমি জানিওনা, অথচ বাবুদের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হলাম। শান্তিপাড়া, সর্ষে, বেজেরডাঙা পার হতে বেলা দুপুর ঘুরে গেল। খিদেও বেশ পেয়েচে। জোয়ান বয়স, হাতে সামান্য কিছু পয়সা থাকলেও খাবারের দোকান এ পর্যন্ত এ-সব অজ পাড়াগাঁয়ে চোখে পড়ল না।

রাস্তার এক জায়গায় ভারি চমৎকার একটা পুকুর। স্নান করতে আমি চিরকালই ভালোবাসি। পুকুরের ভাঙা ঘাটে কাপড় নামিয়ে রেখে জলে নামলাম। জলে অনেক পানা শেওলা, সেগুলো সরিয়ে পরিষ্কার জলে প্রাণভরে ডুব দিলাম। বৈশাখের শেষ, গরমও বেশ পড়েচে, স্নান করে সত্যি ভারি তৃপ্তি হল। পুকুরের ধারে একটা তেঁতুলগাছের ডালে ভিজে কাপড় রোদে দিলাম। শরীর ঠাণ্ডা হল কিন্তু পেট সমানে জ্বলচে। এ সময় কোনো বনের ফল নেই? চোখে তো পড়ে না, যেদিকে চাই।

এমন সময় একজন বুড়ো লোক পুকুরটাতে নাইতে আসচে দেখা গেল। আমাকে দেখে বল্লে—বাড়ি কোথায়?

আমি বললাম—আমি গরিব ব্রাহ্মণ, চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপাতত বড় খিদে পেয়েচে, খাবো কোথায়, আপনি কি সন্ধান দিতে পারেন?

বুড়ো লোকটি বল্লে—রোসো, নেয়ে নি—সব ঠিক করে দিচ্ছি।

স্নান সেরে উঠে লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে জঙ্গলে ঘেরা একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকলো। বল্লে—আমার নাম নিবারণ চক্রবর্তী। এ বাড়ি আমার, কিন্তু আমি এখানে থাকিনে। কলকাতায় আমার ছেলেরা ব্যবসা করে, শ্যামবাজারে ওদের বাসা। এত বড় বাড়ি পড়ে আছে আর সেখানে মাত্র তিনখানা ঘরে আমরা থাকি। কি কষ্ট বলো দিকি! আমি মাসে মাসে একবার আসি, বাড়ি দেখাশুনো করি। ছেলেরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে আসতে চায়। মস্ত বড় বাগান আছে বাড়ির পেছনে। তাতে সবরকম ফলের গাছ আছে—বারো-ভূতে খায়। তুমি এখানে থাকবে?

বললাম—থাকতে পারি।

—কি কাজ করতে?

—রাঁধুণীর কাজ।

—যে কদিন এখানে আছি, সে কদিন এখানে রাঁধে, দুজনে খাই।

—খুব ভালো।

আমি রাজী হয়ে যেতে লোকটা হঠাৎ যেন ভারি খুশী হল। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে তখনি। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাকে একটা পুরোনো মাদুর আর একটা মোটা তাকিয়া বালিশ দিয়ে বল্লে—বিশ্রাম করো।

পথ হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, বেলা তখন নেই। রাঙা রোদ বড় বড় গাছপালার উঁচু ডালে। এরই মধ্যে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে শয়ালের ডাক শুরু হল। আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে বেড়লাম। যেদিকে চাই, সেদিকেই পুরোনো আম-কাঁঠালের বন আর জঙ্গল। কোনো লোকের বাড়ি নজরে পড়লো না। জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে কেবল একটা ভাঙা দেউল দেখতে পেলাম। তার মধ্যে উঁকি মেরে দেখি, শুধু চামচিকের আড্ডা।

ফিরে এসে দেখি, বুড়ো নিবারণ চক্কত্তি বসে তামাক খাচ্ছে। আমায় বল্লে—চা করতে জানো? একটু চা করো। চিঁড়ে ভাজো। তেল-নুন মেখে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পর বল্লে—ভাত চড়িয়ে দাও। সরু আতপ আছে, গাওয়া ঘি আছে, আলু-ভাতে ভাত—ব্যাস!

—যে আঞ্জো ।

—তোমার জন্যে ঝিঙের একটা তরকারি করে নিও। ঝিঙে আছে রান্নাঘরের পেছনে। আলো হাতে নিয়ে তুলে আনো এইবেলা। আর একটা কথা—রান্নাঘরে সর্বদা আলো জ্বেলে রাখবে।

—তা তো রাখতেই হবে, অন্ধকারে কি রান্না করা যায়?

—হ্যাঁ, তাই বলছি।

মস্ত বড় বাড়ি। ওপরে নীচে বোধ হয় চোদ্দ-পনেরোখানা ঘর। এছাড়া টানা বারান্দা। দু-চারখানা ছাড়া অন্য সব ঘরে তালা দেওয়া। রান্নাঘরের সামনে মস্ত বড় লম্বা বোয়াক, রোয়াকের ওমুড়োয় চার-পাঁচটা নারকোল গাছ আর একটা বাতাবি লেবুর গাছ। ঝিঙে তুলতে হলে এই লম্বা রোয়াকের ও-মুড়োয় গিয়ে আমায় উঠোনে নামতে হবে, তারপর ঘুরে রান্নাঘরের পেছন দিকে যেতে হবে। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি, আলোর দরকার নেই ভেবে আমি এমনি শুধু হাতেই ঝিঙে তুলতে গেলাম।

বাবাঃ, কি আগাছার জঙ্গল রান্নাঘরের পেছনে! বুনো ঝিঙে গাছ, যাকে এঁটো গাছ বলে। অর্থাৎ এমনি বীজ পড়ে যে গাছ হয় তাই। অনেক ঝিঙে ফলেচে দেখে বেছে বেছে কচি ঝিঙে তুলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো, একটি বৌ-মতো কে মেয়েছেলে আমার সামনাসামনি হাত-দশেক দূরে ঝোপের মধ্যে নীচু হয়ে আধঘঘামটা দিয়ে আমারই মতো ঝিঙে তুলচে। দুবার আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তারপর পেছন ফিরে সাত-আটটা কচি ঝিঙে তুলে নিয়ে চলে আসবার সময় আর একবার চেয়ে দেখলাম। দেখি বৌটি তখনো ঝিঙে তুলচে।

নিবারণ চক্কত্তি বল্লে—ঝিঙে পেলে?

—“আঞ্জো হ্যাঁ, অনেক ঝিঙে হয়ে আছে। আর একজন কে তুলছিল।

নিবারণ বিস্ময়ের সুরে বল্লে—কোথায় ?

—ওই রান্নাঘরের পেছনে। বেশী জঙ্গলের দিকে।

—পুরুষমানুষ?

—না, একটা বৌ।

নিবারণ চক্কত্তির মুখ কেমন হয়ে গেল। বল্লে—কোথায় বৌ? চলো দিকি দেখি! আমি ওকে সঙ্গে করে রান্নাঘরের পেছনে দেখতে গিয়ে দেখি, কিছই না।

নিবারণ বল্লে—কই বৌ?

—ওই তো ওখানে ছিল, ও ঝোপটার কাছে।

—হুঁ, যতো সব! চলো, চলো। দিনদুপুরে বৌ দেখলে অমনি!

আমি একটু আশ্চর্য হোলাম। যদি একজন পাড়াগাঁয়ের বৌ-ঝি দুটো জংলী ঝিঙে তুলতে এসেই থাকে, তবে তাতে খাপ্পা হবার কি আছে ভেবে পাই নে! তাছাড়া আজ না হয় উনি এখানে আছেন, কাল যখন কলকাতায় চলে যাবেন, তখন বুনো ঝিঙে কে চৌকি দেবে?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চক্কত্তি-বুড়ো আবার সেই ঝিঙে-চুরির কথা তুললে। বল্লে—আলো নিয়ে যাওনি কেন ঝিঙে তুলতে? তোমায় আমি আলো হাতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, মনে আছে? কেন তা যাওনি?

আমি বুঝলাম না কি তাতে দোষ হোল! বুড়োটা খিটখিটে ধরনের। বিনা আলোতে যখন সব আমি দেখতে পাচ্ছি, এমন কি ঝিঙে-চুরি করা বৌকে পর্যন্ত—তখন আলো না নিয়ে গিয়ে দোষ করেছি কি?

বুড়ো বল্লে—না, না, সন্ধ্যার পর সর্বদা আলো কাছে রাখবে।

—কেন?

—তাই বলছি। তোমার বয়স কত ?

—সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে।

—অনেক কম বয়স আমাদের চেয়ে। আমার এই তেষটি। যা বলি কান পেতে শুনো।

—আজ্ঞে নিশ্চয়।

রাত্রে শুয়ে আছি, ওপরের ঘরে কিসের যেন ঘটঘট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। জিনিসপত্র টানাটানির শব্দ। কে বা কারা যেন বাক্স-বিছানা এখন থেকে ওখানে সরাসরে, ভারী জিনিস সরাসরে। বুড়ো কাল সকালে চলে যাবে কলকাতায়, তাই বোধ হয় জিনিসপত্র গোছাচ্ছে! কিন্তু এত রাত্তিরে?

বাবাঃ, কি বাতিকগ্রস্ত মানুষ!

সকালে উঠে বুড়োকে বলতেই বুড়ো অবাক হয়ে বল্লে—আমি?

—হ্যাঁ, অনেক রাতে।

—ও! হ্যাঁ—না—হুঁ—ঠিক।

—আমাকে বল্লেই হোত, আমি গুছিয়ে দিতাম!

চক্কত্তি-বুড়ো আর কিছু না বলে চুপ করে গেল। বেলা নটার মধ্যে আমি ডাল-ভাত আর ঝিঙেভাজা রান্না করলাম। খেয়ে-দেয়ে পোঁটলা বেঁধে সে রওনা হোল কলকাতায়। যাবার সময় বার বার বলে গেল—নিজের ঘরের লোকের মত থেকে ঠাকুর। পেয়ারা আছে, আম—কাঁঠাল আছে, উৎকৃষ্ট পেঁপে আছে, তরিতরকারি পোঁতো, আমার খাস-জমি পড়ে আছে তিন বিঘে। ভদ্রাসন হোল দেড় বিঘের ওপর। লোক-অভাব জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। খাটো, তরকারি উৎপন্ন করো, খাও, বেচো—তোমার নিজের বাড়ি ভাববে। দেখাশুনো করো, থাকো। ভাবনা নেই। আর একটা কথা—

—কি?

চক্কত্তি-বুড়ো অকারণে সুর খাটো করে বল্লে—কত লোকে ভাঙচি দেবে। কারো কথা শুনো না যেন। বাড়ি দেখাশুনো যেমন করবে, নিজের মতো থাকবে, কোনো কথায় কান দেবে না, গাছের ফল-ফুলুরি তুমিই খাবে। দুটো ঘর খোলা রইলো তোমার জন্যে।

বুড়ো চলে গেল। আমাকে যেন আকাশে তুলে দিয়ে গেল। আরে, এত বড় বাড়ির বড় বড় দুখানা ঘর আমার ব্যবহারের জন্য রয়েছে—তাছাড়া বারান্দা, রান্নাঘর, রোয়াক তো আছেই। বাড়িতে পাতকুয়ো, জলের কষ্ট নেই। শুকনো কাঠ যথেষ্ট, কাঠের কষ্ট নেই। দশটা টাকা আগাম দিয়ে গিয়েছে বুড়ো, প্রায় আধ-মণটাকে সরু আতপ চালও আছে। গাছ-ভরা আম-কাঁঠাল। এ যেন ভগবানের দান আকাশ থেকে পড়ল হঠাৎ!

বিকেলের দিকে তেল-নুন কিনবো বলে মুদির দোকান খুঁজতে বেরলাম। বাপ রে, কি বন—জঙ্গল গাঁখানার ভেতরে। আর এদের যেখানে বাড়ি তার ত্রিসীমানায় কি কোনো লোকালয় নেই। জঙ্গল ভেঙে সুঁড়িপথ ধরে আধ মাইল যাবার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল। সেও তেল কিনতে যাচ্ছে, হাতে তেলের ভাঁড়। আমায় দেখে বল্লে—বাড়ি কোথায়?

—এখানে আছি নিবারণ চক্কত্তির বাড়ি।

—নিবারণ চক্রান্তি ? কেন?

—দেখাশুনো করি। কাল এসেচি।

—ও-বাড়িতে থাকতে পারবে না।

—কেন?

—এই বলে দিলাম। দেখে নিও। কত লোক ও-বাড়িতে এল গেল! ওরা নিজেরাই থাকতে পারে না, তা অন্য লোক! ও-বাড়ির ছেলে-বৌয়েরা কস্মিনকালে ও-বাড়িতে আসে না—

—কেন?

—তা কি জানি! ও বড় ভয়ানক বাড়ি। তুমি বিদেশী লোক, খুব সাবধান।

আর কিছু না বলে লোকটা চলে গেল। আমি দোকান খুঁজে জিনিস কিনে বাড়ি ফিরলাম। তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নামচে। দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যকার পুরোনো উঁচু দোতলা। বাড়িখানা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠলো। সত্যি, বাড়িখানার চেহারা কি রকম যেন! ও যেন একটা জীবন্ত জীব, আমার মতো ক্ষুদ্র লোককে যেন গিলে ফেলবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসচে! অমনতর ওর চেহারা কেন?

কিছু না। লোকটা আমার মন খারাপ করার জন্য দায়ী। আমি যখন তেল-নুন কিনতে যাই তখন আমার মনে দিব্যি ফুর্তি ছিল—হঠাৎ এমন হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই লোকটার ভয় দেখানো কথাবার্তা। গায়ে পড়ে অত হিত করবার দরকার কি ছিল বাপু তোমার? চক্রান্তি বুড়ো তো বলেই গিয়েছে, কত লোক কত কথা বলবে, কারো কথায় কান দিও না।

কিছু না, গাছপালার ফুল-ফুলুরি গাঁয়ের লোক চুরি করে খায় কিনা। বাড়িতে একজন পাহারাদার বসালে লুঠপাট করে খাওয়ায় ব্যাঘাত হয়, সেইজন্যেই ভয় দেখানো। যেমন ওই বৌটি কাল সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে চুরি করছিল।

অনেকদিন এমন আরামে থাকিনি। বিনা-খাটুনিতে পয়সা রোজগারের এমন সুযোগ জীবনে কখনো ঘটেনি। নিজের জন্য শুধু দুটো রান্না—মিটে গেল কাজ! সকাল সকাল রান্না সেরে নিয়ে নীচের বড় রোয়াকে বসে আপনমনে গান গাইতে লাগলাম। এত বড় বাড়ির আমিই মালিক। কারো কিছু বলবার নেই আমাকে। যা খুশী করবো।

হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দোতলার নালির মুখ দিয়ে পড়তে লাগলো জল, যেমন ওপরের বারান্দাতে কেউ হাত-পা ধুলে জল পড়ে—বেশ মোটা ধারে জল পড়তে লাগলো। তখনি আমি উঠে রোয়াকের ধারে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে দেখলাম। তখনো জল পড়চে—সমানে মোটা ধারায়। ওপরের সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া। চাবি চক্রান্তি মশায় নিয়ে গিয়েচেন, সুতরাং দোতলার যাবার কোনো উপায় আমার নেই। এ জল কোথা থেকে পড়চে?

মিনিট দশেক পড়ার পর জলের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হল, চক্রান্তি মশায় বোধ হয় কোনো কলসী বা ঘড়াতে জল রেখে দিয়েছিলেন ওপরের বারান্দাতে, সেই কলসী কি-ভাবে উল্টে পড়ে গিয়ে থাকবে। নিশ্চয় তাই, তা ছাড়া জল আসবে কোথা থেকে?

একটু পরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। অনেক রাতে একবার ঘুম ভেঙে গেল, জানালা দিয়ে সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়েচে বিছানায়। কি একটা ফুলের গন্ধও আসচে। বেশ সুবাস ফুলের।

কি ফুল?

ঘুমের ঘোরেই ভাবচি, এমন কোন সুগন্ধওয়ালা ফুল তো বাড়ির কাছাকাছি দেখিনি!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। ও কি! জানলার সামনে দিয়ে একটি বৌ চলে গেল রোয়াক বেয়ে—হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেছি—ভুল হবার নয়। আমি তখুনি উঠে দরজা খুলে রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোয়াকে দাঁড়াতে দুটো জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হল। প্রথম সেই ফুলের সুবাসটা রোয়াকে অনেকখানি ঘন, ঐ বৌটি যেন এই সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল এই কতক্ষণ। না, কোনো ফুলের সুবাস নয়। এ কিসের সুবাস, তা আমার মাথায় আসচে না।

কেমন একরকম যেন লাগচে। একরকম নেশার মতো! কেন আমি বাইরে এসেছি? ও! কে একটি বৌ রোয়াক বেয়ে খানিক আগে চলে গিয়েছিল—সে-ই ছড়িয়ে গিয়েছে এই তীব্র সুবাস, কিন্তু কোনো দিকে নেই তো সে! গেল কোথায় ?

সে-রাত্রে সেই পর্যন্ত। কতক্ষণ পরে ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে মনে হল সব স্বপ্ন। মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। কাজ-কর্মে ভালো করে মন দিলাম। বনজঙ্গল কেটে কিভাবে তরি-তরকারির আবাদ করবো, সেই আলোচনা করতে লাগলাম মনের মধ্যে।

একটা অসুবিধে এখানে থাকবার—বড্ড নির্জনে থাকতে হয়। কাছাকাছি যদি একঘর লোকও থাকতো, তবে এত কষ্ট হত না—কথা বলবার একটা লোক নেই, এই হল মহাকষ্ট।

সেদিন দুপুরে এক ঘটনা ঘটলো।

আমি ভাত নামিয়ে হাঁড়ি রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় দোতলার বারান্দাতে অনেক লোকযেন একসঙ্গে হেসে উঠলো। সে কি ভীষণ অট্টহাসি! আমার গা যেন দোল দিয়ে উঠলো সে হাসি শুনে। খিলখিল করে হাসি নয়—খলখল করে হাসি। আকাশ-বাতাস থমথমিয়ে উঠলো সে হাসির শব্দে।

ভাত ফেলে রেখে দৌড়ে গেলাম। রোয়াকে গিয়ে ওপরের দিকে দেখি, কিছুই না! নিচের জানলা যেমন বন্ধ, ওপরের ঘরের সারবন্দি জানলা তেমনি বন্ধ। হাসির লহর তখন থেমে নিশুপ হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপার কি? কোনো বদমাইশ লোকের দল ওপরে আড্ডা বেঁধেছে? ওপরের সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখি দরজায় তেমনি কুলুপ ঝুলচে!

আমার ভয় হয়নি। কেননা দিনমান, চারিদিকে সূর্যের আলো। এ সময়ের মনের মধ্যে কোন ভূতের সংস্কার থাকে না। এই হাসিই যদি আমি রাত্রে শুনতাম, তবে বোধ হয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চাবি দিয়ে দাঁত খুলতে হত।

রান্নাঘরে ফিরে এসে ভাতের ফেন গেলে ঝিঙের তরকারি চাপিয়ে দিই। প্রচুর ঝিঙে জঙ্গলে ফলেচে, যত ইচ্ছে তুলে নিয়ে খাও। আমারই বাড়ি—আমারই ঝিঙে-লতা। মালিক হওয়ার যে একটা মাদকতা আছে, তা কাল থেকে বুঝি। আমার মতো গরিব বামুনের জীবনে এমন জিনিস এই প্রথম।

কান পেতে রইলাম ওপরের ঘরের কোনো শব্দ আসে কিনা শুনতে। ছুঁচ পড়বার শব্দও পেলাম না। খেয়েদেয়ে নিজের মনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—ঘুমের ঘোরে শুনচি, ঘরের মধ্যে অনেক লোক কথাবার্তা বলচে, হাসচে। ঘুমের মধ্যেও আমি ওদের কথাবার্তা যেন শুনচি, যেমন কোনো বিয়েবাড়িতে ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে লোকজনের গলার শব্দ ঘুমের মধ্যেও পাওয়া যায়। হয়ত সবটাই আমার মনের ভুল। মনের সেই যে ভাব হয়েছিল হাসি শুনে, তারই ফল।

এর পরে ন'দিন আর কোনো কিছু ঘটেনি।

মানুষের মনের অভ্যাস, অপ্রীতিকর জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি দিব্যি ভুলে যেতে চায়, পারেও ভুলে যেতে! আমি নিজের মনকে বোঝালুম, ওসব কিছু না, কি শুনতে কি শুনেছি, বৌ দেখা চোখের ভুল, হাসি শোনাও কানের ভুল। সব ভুল।

এ নদিনে আমার শরীর বেশ সেরে উঠলো। খাই-দাই আর শুধু ঘুমুই। কাজ-কর্ম কিছু নেই—কেমন একরকমের কুঁড়েমি পেয়ে বসেছে আমাকে। আমি সাধারণত খুব খাটিয়ে লোক, শুয়ে বসে থাকতে ভালোবাসিনে—কিন্তু অনেকদিন ধরে অতিরিক্ত খাটুনির ফলে কেমন একরকমের অবসাদ এসে গিয়েছে, শুধুই আরাম করতে ইচ্ছা হয়।

নদিনের দিন বিকেলে মনে হল রান্নাঘরের পেছনে সেই ঝিঙের জঙ্গলটা কেটে একটু পরিষ্কার করি, ঝিঙের লতাগুলো বাঁচিয়ে অবশ্য। ওখানে ঝালের চারা পুঁতবো, আর একটা চালকুমড়োর এঁটো লতা হয়েছে ওই জঙ্গলের মধ্যে, সেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে রান্নাঘরের ছাদে উঠিয়ে দেবো। এ বাড়িতে কাজ করে সুখ আছে; কারণ দা, কোদাল, কাস্তে, নিড়েন, শাবল, কুড়ুল সব মজুত আছে—ঘরের কোণে একটা হাত-করাত ইস্তক।

অল্পক্ষণ মাত্র কাজ করেছি—আধ ঘণ্টাও হবে না।

হঠাৎ দেখি, সেই বৌটি ঝিঙে তুলতে এসেছে। নীচু হয়ে ঝোপের মধ্যে ঝিঙে তুলচে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ঘরগুলোর মধ্যে এক মহা-কলরব উপস্থিত হল। অনেকগুলো লোক—আন্দাজ জনাপঞ্চাশেক, একসঙ্গে যেন হৈ-চৈ করে উঠলো—সব দরজা-জানলা যেন একটা ঝড়ের ঝাপট লেগে একসঙ্গে খুলে গেল।

বন কাটা ফেলে আমি ওপরদিকে চেয়ে দেখলাম। সামনের রোয়াকে এসে দাঁড়ালাম— কই, একটা দরজা-জানলার কপাটও খোলেনি দোতলার! যেমন তেমনি আছে!

ব্যাপার কি? বাড়িটার মৃগী রোগ আছে নাকি? মাঝে মাঝে এমন বিকট চীৎকার ওঠে কেন? এবার তো ভুল হবার কোনো কথা নয়—সম্পূর্ণ সুস্থমনে কাজ করতে করতে এ চীৎকার আমি শুনেছি এইমাত্র। এখন আবার চারিদিক নিঃশব্দ, কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই।

সেই বৌটি আবার ঝিঙে তুলতে এসেছে এই গোলমালের মধ্যে! দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরের পেছনে। সেখানেও কেউ নেই।

সেদিন রাত্রে এক ঘটনা ঘটলো। ভারি মজার ঘটনা বটে।

খেয়েদেয়ে সবে শুয়েছি, সামান্য তন্দ্রা এসেছে—এমন সময় কিসের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। চেয়ে দেখি, আমার বিছানার চারিপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েছে তাদের সবারই মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে ছোট ছোট লাঠি—আশ্চর্যের বিষয়, সকলেরই মুখ দেখতে একরকম। একই লোক যেন পঞ্চাশটি হয়েছে, এইরকম মনে হয় প্রথমটা। বহু আরশিতে যেন একটা মুখই দেখছি।

কে যেন বলে উঠলো—আমাদের মধ্যে আজ কে যেন এসেছে!

একজন তার উত্তর দিলে—এখানে একজন পৃথিবীর লোকের বাড়ি আছে অনেক দিন থেকে। আমি দেখিনি বাড়িটা, তবে শুনেছি। যারা দেখতে জানে, তারা বলে—সেই বাড়ির মধ্যে একটা লোক রয়েছে।

—সব মিথ্যে! কোথায় বাড়ি?

—আমরা কেউ দেখিনি।

—তবে এসো, আমরা নাচ আরম্ভ করি।

বাপ রে বাপ! কথায় বলে ভূতের নেতা! শুনেই এসেছিলাম এতদিন, এইবার স্বচক্ষে দেখলাম। সে কি কাণ্ড! অতগুলো লোক একসঙ্গে লাঠি বাজিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলে। আমার দেহের মধ্যে দিয়ে কতবার যে এল গেল! তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার আর হুন্না!

আমার বিছানার বা আমার কোনো অংশ তারা স্পর্শও করলো না। আমি যে সেখানে আছি, তাও যেন তারা জানে না। ওদের হুক্কর আর ভৈরব নৃত্যে আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হল, তখন শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্না খোলা জানলা দিয়ে এসে বিছানায় পড়েচে। সেই ফুলের অতি মৃদু সুবাস ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসে। আমি আধ-অচেতন ভাবে জানলার বাইরে জ্যোৎস্নামাখা গাছপালার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না ভোর হয়ে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। সুনিদ্রা হলে শরীর যেমন ঝরঝরে আর সুস্থ হয়, তেমনি বোধ করছি।

তবে সে ভূতের নাচ কে দেখেছিল? সে নাচ কি তবে ভুল? খেয়েদেয়ে পরম আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছি?

তাই যদি হয়, তবে এই শেষ-রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যে ফুলের সুবাস পেয়েছি, তা কোথা থেকে এলো? সেই বৌটি যখন চলাফেরা করে, তখনি অমন সুবাস ছড়ায় বাতাসে। সুবাসটা ভুল হতে পারে না। এখনো সে-গন্ধ আমার নাকে লেগে রয়েছে।

কোনো অজানা বন-ফুলের সুবাস হয়তো। তাই হবে।

তেল কিনতে গিয়েচি দোকানে, দোকানী বল্লে—কি রকম আছো? বলি, কিছু দেখচো নাকি?

—না

—শুনচো কিছু?

—না।

—তুমি দেখচি সাধু লোক। তুক—তাক জানো নাকি? ভূতের মন্তর ?

—তেল দাও, চলে যাই। ওসব বাজে কথা।

—আচ্ছা, একটা মেয়েকে ওখানে কোনো দিন দ্যাখোনি? বৌ-মত? কোনো গন্ধ পাওনি?

—কিসের গন্ধ ?

—কোনো ফুলের সুগন্ধ?

—না।

—খুব বেঁচে গিয়েচ তুমি। তোমার আগে যারা ওখানে থাকত, তারা সবাই একটি বৌকে দেখতো ওখানে প্রায়ই। এমন হত শেষে, ও বাড়ি ছেড়ে তারা নড়তে চাইতো না। তারপর রোগা হয়ে দিন দিন শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যেত। দু'টি লোকের এই রকম হয়েছে এ পর্যন্ত। বাড়িতে ভূতের আড্ডা। ভূতে লোককে পাগল করে দেয়। তাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, এমন ভালো লাগে এ বাড়ি—না খেয়ে, না দেয়ে ওখানে পড়ে থাকে—ছেড়ে যেতে চায় না। তুমি দেখচি ভূতের মন্তর জানো। আমরা তো ও-বাড়ির ত্রিসীমানায় যাইনে। মাথা খারাপ করে দেয় সাধারণ মানুষের।

তেল নিয়ে চলে এলাম। ভাবতে ভাবতে এলাম, মাথা খারাপ হওয়ার সূত্রপাত আমারও হল নাকি? বাড়ির সীমানায় পা না দিতেই আমারও মনে হল, নাঃ সব ভুল। পরম সুখে আছি। এ ছেড়ে কোথায় যাবো? বেশ আছি, খাসা আছি, তোফা আছি।

সেই থেকে আজ দু'বছর পড়ে আছি এ বাড়িতে। চক্কত্তি মশায় মাইনে-টাইনে কিছুই দেয় না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বাড়ি দেখাশুনো করি, বেগুন-কলা বেচি, দিনরাত গুঁদের নৃত্য দেখি, গুঁদের মধ্যেই বাস করি—এক-পা যাইনে বাড়ি ছেড়ে।